60

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 11 FEB 1994
পৃষ্ঠা ৭৫ কলাম ২

গণশিক্ষা

তরুণরাই দায়িত্ব নিতে পারে

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)-এর পুরকৌশল ভবনের একটি কক্ষ। ১৯৯২-এর নভেম্বর মাস। ছিমছাম বিকেল। কক্ষের ভেতর প্রায় অর্ধশত ছাত্র। সকলেই সদ্য ভর্তিকৃত।

শিক্ষক তাঁর আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন, ব্লাকবোর্ডে ইতস্তত কিছু শব্দ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। যেমন- সাক্ষর, স্বাক্ষর, বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার মাত্র ২৪%, বুয়েট ছাত্র কল্যাণ পরিদপ্তর, ... ইত্যাদি। শিক্ষক ছাত্রদের অক্ষর পরিচয় করাচ্ছেন। ছাত্রদের দিকে পেছন ফিরে বাম হাত কোমরে ঠেকিয়ে জিজ্ঞেস করছেন-

এটা কি অক্ষর?

ছাত্রেরা একযোগে বলছে- ব।

তাহলে 'ব' কি রকম?

বাঁকানো বাঁ হাতের মত।

'ল' কেমন?

লতার মত।

'দ' কেমন?

দা-য়ের মত।

তাহলে 'বলদ' কিভাবে লিখতে হবে?

ছাত্রেরা সমস্বরে বলতে লাগল- ব,ল আর দ- বলদ।

এভাবেই চলল পাঠদান প্রক্রিয়া।

কাউকে যদি বলা হয় যে, বুয়েটে ছাত্রদের বাংলা অক্ষর জ্ঞান দেয়া হচ্ছে, তাহলে লোকটি নিশ্চয়ই কৌতূহলী না হয়ে পারবেন না। তিনি ভাববেন- বুয়েট বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষার অন্যতম সেরা বিদ্যাপীঠ, সেখানে অক্ষরজ্ঞান দেয়া হবে কেন? প্রকৃতপক্ষে, ব্যাপারটা ভিন্ন। সে সময় বুয়েটে ১৯৯১-৯২ সেশনের ভর্তি চলছি। আর সেখনকার সেশনজটের কল্যাণে নতুন ভর্তি হওয়া ছাত্রেরা পড়াশোনাহীন বিশ্রামের একটা দীর্ঘ সুযোগ পায়। এই বিশ্রামের মেয়াদ আগে কম ছিল, বর্তমানে তা এসে দাঁড়িয়েছে দশমাস থেকে এক বছরে।

এদিকে বুয়েটের ছাত্রকল্যাণ পরিদপ্তর সরকারী অনুমোদনে একটি জনকল্যাণ মূলক কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। সেটি হল গণশিক্ষা কার্যক্রম। উল্লেখ্য, বুয়েট ছাত্রকল্যাণ পরিদপ্তরের বর্তমান পরিচালক প্রফেসর ডঃ আইনুন নিশাত। তাঁরই ঐকান্তিক চেষ্টায় এ কার্যক্রমের শুরু। আর এই গণশিক্ষা কার্যক্রমের শিক্ষক নির্ধারণ করা হয়েছে সেই 'বসে থাকা' ছাত্রদেরকে।

প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে তাদের বিশ্রামের সময়টুকুতে নিজ নিজ এলাকায় গিয়ে সেখানকার ন্যূনতম দশজন নিরক্ষরকে অক্ষরজ্ঞান দান করতে হবে। বিনিময়ে পাওয়া যাবে কেবল একটা সার্টিফিকেট। বুয়েটের ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৫১০ জন ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তি প্রক্রিয়া চলছিল। পর্যায়ক্রমে প্রতি দিন ৫০ জন করে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করিয়ে বিকেলে তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছিল গণশিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ব্যাপারে।

তিন ঘন্টার এই প্রশিক্ষণ শেষে প্রত্যেকের হাতে দেয়া হয়েছিল দশটি বই, দশটি খাতা ও দুই ডজন বলপেন। এ ছাড়া প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য ভাতা হিসেবে প্রত্যেককে প্রদান করা হয়েছিল একটি করে ৫০ টাকার নোট। প্রশিক্ষণচলাকালে টিফিন হিসেবে ছিল নাস্তার ব্যবস্থা। বইখাতার সাথে দুটো ফরম দেয়া হয়েছিল। এদের একটি হল প্রাথমিক রিপোর্ট, যেটা কার্যক্রম শুরুর পর পরই পূরণ করে পাঠাতে হবে। অপরটি চূড়ান্ত রিপোর্ট ফরম, যেটা কার্যক্রম সমাপ্ত হওয়ার পর পূরণ করে জমা দিতে হবে।

বুয়েটে উক্ত ১৯৯১-৯২ সেশনের ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাশ শুরু হয়েছিল ১৯৯৩-এর ২৬ সেপ্টেম্বর, অতএব, গণশিক্ষা কার্যক্রমের জন্যে ওরা সময় পেয়েছিল পুরো ১০ মাস। আর নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে এক বা একাধিক নিরক্ষরকে সাক্ষর করার জন্যে প্রয়োজন সর্বনিম্ন ১ মাস থেকে সর্বোচ্চ সাড়ে তিন মাস। কাজেই সময়কালের ব্যাপারটা সবার কাছে সুবিধেজনক ছিল বলেই ধরে নেয়া যায়। ছাত্র-ছাত্রীদের তথা গণশিক্ষকদের পাঠানো রিপোর্ট থেকে দেখা যায় কেউ কেউ বারজনকে, আবার কেউ কেউ পনেরজনকে পর্যন্ত পাঠদান করতে সক্ষম হয়েছে। তবে খুব অল্প সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী এ দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে। নিজেদের অদক্ষতা বা ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতা কিংবা নিরক্ষরদের পড়ালেখার প্রতি চরম অনীহার কারণেই হয়ত তারা সক্ষম হয়নি।। ধরা যাক, ৫১০ জনের মধ্যে ৪৫০ জনই সাক্ষরতা প্রদানে সমর্থ হয়েছে। আর প্রত্যেকে গড়ে ১০ জনকে অক্ষর জ্ঞানদান করলে ঐ ব্যাচের সকল ছাত্র-ছাত্রীর দ্বারা সারা দেশের প্রায় সাড়ে ৪ হাজার নিরক্ষর সাক্ষরতা লাভ করেছে।

সহজ হিসেবেই দেখা যায়, দু'হাজার ছাত্র-ছাত্রীর একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যদি প্রতি বছর সাড়ে ৪ হাজার নিরক্ষর লোককে সাক্ষর করতে পারে, তবে ২০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী বিশিষ্ট একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনায়াসে প্রতি বছর দেশে ৪৫ হাজার সাক্ষর নাগরিক তৈরী করতে পারে। এ ছাড়া একজন ছাত্র বা ছাত্রী এস,এস সি, এইচ, এস সি বা ডিগ্রী পরীক্ষা দেয়ার পর রেজাল্টের পূর্ব পর্যন্ত সময়টুকু সাধারণত ব্যস্ততাহীনভাবে কাটিয়ে দেয়।

প্রাতিষ্ঠানিক চাপ না থাকুক, অন্তত দেশের কথা ভেবে একান্ত মানবিক কারণে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রী যদি তার বিশ্রামের সময়টুকুকে ন্যূনতম পক্ষে মাত্র তিনজন নিরক্ষরকে অক্ষরজ্ঞান দিতে পারে তবেই নব্যসাক্ষরের একটা বড়সংখ্যা আমরা পেতে পারি। আর তা সম্ভব হলে বাংলাদেশের সাক্ষরতার হার ছন্দময় গতিতে দিনদিন বাড়তে থাকবে নিঃসন্দেহে। দেশের তাবৎ সচেতন ছাত্র-ছাত্রী তথা শিক্ষিত তরুণ-তরুণী যদি এ বিষয়টি অনুধাবন করতে পারে এবং সে অনুযায়ী একটু সচেষ্ট হয়, তবেই অনায়াসে ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো জ্বালানো সম্ভব হবে। প্রিয় তরুণ-তরুণী, আমরা কি পারি না প্রিয় মাতৃভূমির জন্যে এমন সহজ একটা দায়িত্ব পালন করতে?

❑ মহিউল আলম স্বাধীন